অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ

কেরক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক আমাকে একজন অগ্রজ লেখক বিবেচনা করে অভিজিৎ সেনের সাহিত্যকীর্তির ওপর লিখতে বলায় আমি গর্ব বোধ করি, তার চেয়ে বিব্রত হই অনেক বেশি। অভিজিৎ সেনের প্রকাশিত সবগুলো বই পড়েছি, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক পশ্চিম বাংলার অন্যান্য লেখকদের, ঠিক করে বললে, 'অন্য' ধারার লেখকদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ এখানে কম। ঢাকার বইয়ের দোকানগুলোর সারি সারি সেলফ যাঁদের বই দিয়ে ঝকমক করে তাঁরা পশ্চিম বাংলার সব জাঁদরেল লেখক। অভিজিৎ সেন কিংবা ঐ বিরল প্রজাতির লেখক পাঠকের মনোরঞ্জন করা যাঁদের কায়মনোবাক্যের সাধনা নয় — ওঁদের বই এখানে পাওয়া মুশকিল। আবার গত শতাব্দীর কোম্পানির কাগজের মতোই দামি কলকাতার সব বড় বড় 'হৌস'-এর রঙবেরঙের ঢাউস পত্রিকার স্তূপে এখানে শাহবাগ, মতিঝিল, স্টেডিয়ামের ফুটপাথে পা রাখা দায়, সেখানে কী পশ্চিম বাংলা কী বাংলাদেশের ঐসব লিটল ম্যাগাজিনের ঠাঁই কোথায়, যেখানে ব্যক্তিতে সমাজে ও ইতিহাসে ব্যাপক ও গভীর খোঁড়াখুঁড়ির কাজে নিয়োজিত লেখকদের মজবুত চেহারা দেখতে পাওয়া যায়? কলকাতার কথা জানি না, তবে ঢাকায় পশ্চিম বাংলার এসব লেখক ঘোরতরভাবে অনুপস্থিত। তো এঁদের অধিকাংশের লেখার সঙ্গে পরিচিত না-হয়ে কেবল দুটো বছর আগে লিখতে শুরু করেছি বলে এঁদের বড়দার মেকআপ নেওয়ার মতো বুকের পাটা আমার নেই।

না, অগ্রজ লেখক হিসাবে কিছুতেই নয়, অভিজিৎ সেনের লেখা নিয়ে কথা বলার ভরসা করি অন্য বিবেচনা থেকে। প্রিয় লেখকের বই পড়ে প্রতিক্রিয়া জানাবার এখতিয়ার নিশ্চয়ই যে কোনো পাঠকের আছে।

অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়* অপ্রত্যাশিতভাবে পাই ১৯৮৭ সালে, কলকাতা থেকে আমার বন্ধু দিলীপ পাঠিয়ে দিয়েছিল। পড়তে শুরু করেই বইটি

দারুণ মনোযোগ দাবি করল, পড়তে হয়েছিল আস্তে আস্তে। একটানা পড়বার মতো বই নয়, পাঠককে গ্রাহক ঠাউরে নিয়ে সেঁটে রাখার ফন্দি এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। পড়তে পড়তে কাহিনীর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া এখানে অসম্ভব, বরং বইটিকে যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। এদিকে প্রধান চরিত্রের নামও বারবার ভুলে যাচ্ছিলাম, তাকে খুঁজতে একটু কষ্টই হচ্ছিল। পরে বুঝতে পারি প্রধান চরিত্র বলতে যা বোঝায় সেরকম একজন পুরুষ বা একজন মহিলা এখানে খোঁজা নিরর্থক। না, নায়ক খুঁজিনি। উপন্যাস থেকে নায়ককে বহিষ্কার করা হয়েছে, সে তো আজ অনেকদিন আগে। লেখকের লাই পেয়ে খাড়ি সাইজের চিমকাদুনে একটি শিশু সারা বই জুড়ে প্যানপ্যান করলে তাকে জলজ্যান্ত নায়ক বলে শনাক্ত করা সাহিত্যের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত সমালোচক ডেজিগনেশনধারী কর্মকর্তা ছাড়া আর কারো সাধ্যি নয়। কিন্তু এই *রহু চণ্ডালের হাড়* বইতে নায়ক পাওয়া গেল, চোখের জলে নাকের জলে গলে-যাওয়া-মাংসপিণ্ডের প্রধান চরিত্র নয়, খটখটে হাড্ডির নায়ককে এখানে বেশ হাড়ে হাড়ে ঠাহর করা যায়। কিন্তু এই নায়ক কোনো একজন ব্যক্তি নয়, সে ব্যক্তি নয়, একবচন নয়। সে হল বহুবচন। তার নাম কী?

—নাম বাজিকর। বাজিকর একটা গোষ্ঠী।

—নিবাস?

—তামাম দুনিয়া।

ঘর নেই বলে দুনিয়া জুড়ে তার নিবাস। ঘর হারাবার পর থেকে তারা ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে দিনের পর দিন। কোনো এককালে তারা ছিল গোরখপুরে। ভূমিকম্পে সেখান থেকে উৎখাত হয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়েছিল রাজমহল। সেখান থেকে মণিহারিঘাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি হয়ে মালদা। পূর্বের দিকে তাদের যাত্রা। পূবদিকে সূর্য ওঠে, তাদের পূর্বপুরুষ বলেছিল পূবেই যেন থিতু হয় তারা। তাই মালদা হয়ে রাজশাহী, তারপর পাঁচবিবি। সেখানে মার খেয়ে ফের যেতে হয় পশ্চিমের দিকে। তা ঘর তো আরো কারো কারো থাকে না। কিন্তু তাদের গন্তব্য থাকে। ইহুদিরা হাজার হাজার বছর ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু তাদের জন্য ছিল প্রতিশ্রুত দেশ, ঈশ্বর তাদের পছন্দ করেন, পছন্দের বান্দাদের জন্য তিনি খাস জায়গা রেখে দিয়েছিলেন। তাদের পয়গম্বররা সবাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, পয়গম্বররা জানত ইহুদিদের ঘর একদিন—না—একদিন মিলবেই। কিন্তু এই বাজিকরদের কোনো দেশ তাদের জন্য অপেক্ষা করে না, নিজেদের দেশ তাদের নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হবে।

—বেশ তো, নিবাস ঠিকানাহীন। তবে তাদের ধর্ম কী? কী জাতি?

বাজিকর এবার লা-জওয়াব। নিজেদের ধর্ম যে কী তা তাদের জানা নেই। প্রচলিত

ধর্মগুলোর কোনোটিকেই তারা সচেতনভাবে গ্রহণ করেনি, আবার ধর্মও তাদের নেয়নি দিয়েছে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেনি। তারা ধার্মিক নয়, আবার এই কারণেই বস্তুবাদী হওয়াও তাদের সাধ্যের বাইরে। এতে বাজিকর যে আরামে দিন কাটায় তা নয়, তার কাছে আল্লা ভগবান নামে এমন কোনো পাত্র নেই যার ভেতর তার বিবেচনা, অভিজ্ঞতা সব ঢেলে দিয়ে সে নিশ্চিত হতে পারে।

—তাহলে তার ভাষা কী?

এরকম একটি মূলোৎপাটিত গোষ্ঠীর ভাষার পরিচয় দেওয়া কি সোজা? তার যা আছে তাকে বহুজনের বুলি বলা যায়। তার যেখানে রাত সেখানে কাত, তেমনি যেখানে যায়, কিছুদিন থাকতে থাকতেই সেখানকার বুলি সে জিভে তুলে নেয়। পায়ের মতো জিভও তার বড় পিচ্ছিল, কোনো জায়গার বুলিই তার মুখে ভাষা হওয়ার সময় পায় না, দেখতে-না-দেখতে বাজিকর চলে যায় অন্য কোথাও, সেখানে গিয়ে সে নতুন বুলি রপ্ত করে।

রহু চণ্ডালের হাড়-এর এই গৃহহীন, ভূমিবঞ্চিত, ধর্মমুক্ত বাজিকর গোষ্ঠী একটি স্থায়ী ঠিকানার খোঁজে দিনের দিন, বছরের পর বছর, এক শতাব্দী পেরিয়ে আরেক শতাব্দী জুড়ে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়, এক নদী পেরিয়ে অন্য নদীর তীরে, পাহাড় পাড়ি দিয়ে আরেক পাহাড়ের উপত্যকায় তাঁবু গাড়ে, জমি পেলে লাঙল চষে, মাঠের জানোয়ার পোষ মানায়, গৃহস্থের পশু হাতাতেও তাদের জুড়ি নেই, সেখানকার বুলি তুলে নেয় মুখে। কিন্তু আসন পেতে বসা তাদের কপালে নেই, অভিশপ্ত পূর্বপুরুষের পাপে (?) তারা ঠিকানাবিহীন মানুষ।

কিন্তু এই পরম অনিশ্চিত বেপরোয়া জীবনযাপন সত্ত্বেও এদের বেঁচে থাকবার সাধে এতটুকু চিড় ধরে না। এদের সংগঠিত রাখার জন্য ঢিলেঢালা আয়োজন করত এদেরই কোনো সরদার, তাদের চেহারা ও ব্যক্তিত্ব অনেকটা সেমেটিক পয়গম্বরদের মতো। দনু, পীতেম, জামির— নিজেদের লোকজন সম্বন্ধে এদের ভাবনা ও উদ্বেগ, দায়িত্ববোধ ও মনোযোগ পয়গম্বরদের চেয়ে কম কী? মাঝে মাঝে এদের মধ্যে যে-হিংস্র আচরণ দেখি কিংবা যেভাবে প্রবল হিংসার শিকার হয় তাতেও বাইবেলের কথাই মনে পড়ে বৈকী। এরা বারবার মনে করে: রহু এদের সহায় কিন্তু রহু, একেবারেই মানুষ। জেহোভা কী ট্রিনিটি কী আল্লার মহামহিম অলৌকিক শক্তি এদের কোথায়? সর্বশক্তিমান কোনো দেবদেবী এদের নেই। সমাজের মূলধারায় ধর্মবোধ-নিয়ন্ত্রিত নৈতিকতা কী অনৈতিকতা কিংবা রাষ্ট্র পরিচালিত শৃঙ্খলা কী নিতান্ত বিশৃঙ্খলা এদের গোষ্ঠীজীবনে অনুপস্থিত। দেবদেবী কী আল্লারসুলের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার কী সঁপে দেওয়ার সুযোগ নেই

বলে নিজেদের ভালোমন্দ এদের ঠিক করতে হয় নিজেদেরই। একদিকে তাই অবাধ স্বাধীনতা, অন্যদিকে কঠিন দায়িত্ববোধ। স্থায়ী ঠিকানা পেতে হলে কঠিন কাঠামোর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, স্বাধীনতা তখন বিসর্জন না-দিয়ে উপায় থাকে না। সমাজের মূলধারার মানুষের মতোই থিতু হবার বাসনা এদের প্রবল, অথচ গোরখপুরের ভূমিকম্পে উৎখাত হওয়ার অনেক আগেই অস্পষ্ট অতীতকালেও কিন্তু এরা ছিল কোন মরু এলাকার মানুষ, সেখানেও তো যাযাবর হয়েই জীবনযাপন করেছে। এই এত দীর্ঘকালের পদযাত্রার লক্ষ্য স্থায়ী ঠিকানা। তারা চেয়েছে গৃহস্থ হতে: দোর থাকবে, হাল লাঙল থাকবে, আর থাকবে জমি। পথে পথে দেবদেবী জোগাড় করলেও কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। সম্মানিত ও দাপটের দেবদেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেও এরা অচ্ছুৎই রয়ে যায়। এদের একটি অংশ কলেমা পড়ে ঠাঁই মাগে আল্লারসুলের দরবারে। আখেরাতে রহমানুর রহিম তাদের জন্য কী বরাদ্দ করেছে অতদূর ভাবনার শক্তি তাদের নেই, তাই নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু কলেমা পড়লেও ভদ্রলোক মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান আগের মতোই রয়ে যায়। বৃহত্তর সমাজে মিশে যাওয়ার এই প্রচণ্ড ইচ্ছা থেকেই একদিন-না-একদিন তারা মূলধারায় বিলীন হবে, এজন্য দাম দিতে হয় খুব চড়া। নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু মর্যাদা পায় না। বাজিকরের ব্যক্তির অভিমান ও গোষ্ঠীর গর্ব বাঁধা থাকে একই তারে, যেখানে যায় সেখান থেকেই উচ্ছেদ হবার গ্লানি এবং ঠিকানা জোগাড় করার সংকল্প প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও এই গোষ্ঠীর মধ্যে এমনভাবে প্রবাহিত যে ব্যক্তি ও সমষ্টির আলাদা পরিচয় পাওয়া মুশকিল। প্রেম, কাম, ক্রোধ, হিংসা, বাৎসল্য, ঈর্ষা, ক্ষোভ, লোভ এবং সাধ এই উপন্যাসে এসেছে এক একজন মানুষের ভেতর দিয়েই, কিন্তু তা কখনই আলাদা হয়ে থাকে না, একই সঙ্গে পরিণত হয় বাজিকরের গোষ্ঠীর সাধারণ অনুভূতিতে। কিন্তু মূলধারায় লীন হলে কিংবা আরো স্পষ্ট করে বললে বিলীন হলে এই চেহারা ধ্বংস হয়ে যায়, ব্যক্তি ও সমাজের একাত্মতা সেখানে নষ্ট হতে বাধ্য।

মূলধারার মানুষ বিচ্ছিন্ন মানুষ। ব্যক্তিস্বাধীনতার ডঙ্কা পিটিয়ে বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভব, অন্যের শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির এই বহুঘোষিত স্বাধীনতা রূপ নেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এবং পুঁজির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়ে আজ এর পরিণতি ঘটেছে আত্মসর্বস্বতায়, এখন ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নাম করা যায় ব্যক্তিসর্বস্বতা। ব্যক্তিসর্বস্বতা দিয়ে চিহ্নিত সমাজও যে-শিল্প সৃষ্টি করে তা দিনদিন স্যাঁতসেঁতে হয়ে আসছে রুগ্ন ও রোগা এক ব্যক্তির কাতরানিতে। এই রুগ্ন লোকটির ভেতরটা ফাঁকা ও ফাঁপা। অভিজিৎ সেন এই ফাঁকা ও ফাঁপা লোকের গল্প ফাঁদতে বসেননি। তিনি যে-শক্তির ইঙ্গিত দেন তা

Scanned with CamScanner

কোনো ব্যক্তির নয়, কেবল একটি গোষ্ঠীর নয়, বরং তা হল মানুষের শক্তি। মূলধারার সঙ্গে বিলীন হতে উদগ্রীব গোষ্ঠী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হতে শক্তি হারায়, তার স্বাধীনতা লোপ পায়। আগেই বলেছি, বাজিকরদের দীর্ঘ পদযাত্রা তাদের ঘর দিলেও দিতে পারে, কিন্তু সেই ঘরে মর্যাদা নেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবানদের কবজার ভেতর নিষ্পিষ্ট হওয়াই এদের পরিণতি। এই সমাজের যারা মালিক মানবিক বিকাশের সমস্ত পথ কিন্তু তাদের জন্যও বন্ধ, একটি মস্ত চাকার কাঁটা হয়ে তারা সমাজকে বিঁধতে থাকে, কিন্তু চাকা ঘোরে তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে, চাকা এগিয়ে নেওয়ার সৃজনক্ষমতা থেকে তারা বঞ্চিত অথবা সে অধিকারও তাদের থাকে না।

রহ চণ্ডালের হাড় -এর কাহিনী এসে ঠেকেছে এই শতাব্দীর ষাটের দশকে। দেশ তখন স্বাধীন ও বিভক্ত। প্রশাসনকে নতুনভাবে সাজাবার উদ্যোগ চলছে। কিন্তু সমাজকাঠামোর বদল না-ঘটিয়ে প্রশাসনের সংস্কার শোষণব্যবস্থায় ভাঙন তো দূরের কথা, এতটুকু চিড়ও ধরাতে পারে না। কোনো ব্যক্তি কী কয়েকজন ব্যক্তির সদিচ্ছা ও সংকল্প থাকা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে থেকে শোষণব্যবস্থার ওপর কোনো আঘাত হানতে পারে না, প্রোথিত প্রতিষ্ঠানকে টলানো তার কিংবা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এমনকী প্রশাসনের একটি অংশ হলেও পারবে না। *অন্ধকারের নদী* উপন্যাসে অশোক হল প্রশাসনের একটি খুঁটি, স্তম্ভ নয়, নিচের দিকের একটি খুঁটি। তবু রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তার একটি ভূমিকা রয়েছে।

অশোক একজন সৎ মানুষ এবং নিষ্ঠাবান প্রশাসক। রাষ্ট্রের সংবিধানের নিয়মকানুন ব্যবহার করেই সামাজিক প্রতারণা ও শঠতা থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার জন্য সে উদ্যোগ নেয়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন প্রয়োগে সে বেশ শক্ত হয়। কিন্তু এই শক্তি তো রাষ্ট্রের শক্তি। রাষ্ট্রের কাজ সামাজিক শোষণকে সুসংগঠিত পদ্ধতির ভেতর রেখে পরিচালনা করা। পদ্ধতির ভেতরে মাঝে মাঝে ঢিল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, এর উদ্দেশ্য হল শিকারকে একটু বিচরণ করতে দিয়ে তাকে নিয়ে খেলা যাতে হঠাৎ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সে দড়ি ছেঁড়ার কাজে না-মাতে। রক্ষণ উদ্ভরপুরুষরা যে-মূলধারার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেই ধারাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সমাজের স্থিতিশীলতাকে ঠিক রাখা অর্থাৎ শোষণব্যবস্থার শরীরটিকে হৃষ্টপুষ্ট রাখার জন্য প্রণীত আয়োজনকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেওয়াই হল অশোকের সরকারি দায়িত্ব। এই বিশাল আয়োজনকে পণ্ড করার জন্য তো আর অশোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি ছোট নাটবল্টু হল আমাদের অশোক সাহেব। নাটবল্টু থাকবে নাটবল্টুর মতো, তার নড়াচড়া রাষ্ট্র সহ্য করবে কেন? করেওনি। রাষ্ট্রের কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পায় এবং রাষ্ট্রই আরো সূক্ষ্ম নিয়মে তাকে শাস্তি প্রদানের আয়োজন চলে।

প্রশাসনে তৎপর না-হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকলে রাষ্ট্রের গায়ে আঁচড়টা লাগার সম্ভাবনা কম। তৎপর হতে গিয়ে অশোক ভুল করে। তৎপর মানুষের প্রতিক্রিয়াও চাপা থাকে না, বরং তা প্রকাশ করাও তৎপরতার প্রধান অংশ। যে যারা রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কবজা করেছে তার পাণ্ডারা ঘটনা ঘটায়, আবার এর প্রতিকার চায় যারা, তাদের হাতেও একই ঝাণ্ডা। অশোক এই ধাপ্পাবাজির শিকার। এই ধাপ্পাবাজিতে ক্রুদ্ধ হয় অভিজিৎ সেন নিজেও।

আমার বন্ধু মাহবুবুল আলম *অন্ধকারের নদী* পড়ে একটি মন্তব্য করে; মাহবুব লেখার ব্যাপারে অলস বলে ওর কথাটা আমিই লিখি: *অন্ধকারের নদী* তে উনিশ শতকের বাংলা নকশা জাতীয় রচনার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের কাহিনী রচনার চেয়ে লেখক অনেক বেশি মনোযোগী সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরার কাজে। তবে প্যারীচাঁদ মিত্র কী কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেদের সময়কে তুলে ধরেন অতিরঞ্জন ও হাস্যবিদ্রূপ দিয়ে, অভিজিৎ সেখানে সামাজিক অন্যায়কে প্রকাশের সময় নিজের প্রবল ক্রোধ প্রকাশ না-করে পারেন না। এই ক্রোধ তাঁর পূর্বসূরীদের শ্লেষের চেয়ে অনেক তীব্র। তবে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে লেখকের কান্না লুকোবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

আমার কাছে কিন্তু *অন্ধকারের নদী* উপন্যাস। এর কোথাও অসামঞ্জস্য নেই, টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে কাহিনী সাজাবার চেষ্টাও অভিজিৎ করেননি। তবে হ্যাঁ, বইটির আগাগোড়া ক্রোধ বড় স্পষ্ট। তাঁকে রাগ কমাতে বলা মানে নিরপেক্ষ হতে বলা। না, অভিজিৎ সেনকে নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য মিনতি করা হচ্ছে না। এখন কোনো সৎ মানুষের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। এখন নিরপেক্ষ লেখক জন্মান না, জন্মিয়া কাজ নাই। কিন্তু অভিজিতের ক্রোধ তাঁকে উত্তেজিত করেছিল, ফলে ওই উপন্যাসের অনেক জায়গায় তিনি অস্থির। বাজিকরদের দেড়শো বছরের দীর্ঘ পর্যটন তিনি অনুসরণ করেছেন পরম ধৈর্য নিয়ে। অভিশপ্ত রহ পয়গম্বরের বংশধরদের জীবনকে তিনি এমনভাবে দেখেন যে তাদের প্রকাশ করার জন্য তারাই যথেষ্ট, অভিজিৎকে সেখানে গায়ে পড়ে আসতে হয় না। কিন্তু *অন্ধকারের নদী*তে উত্তেজিত অভিজিৎ এসে পড়েন নিজেই। তাই অশোককে উপচে ওঠে তার উপস্থিতি। ফলে জ্যান্ত মানুষের রক্তমাংস থেকে অশোক মাঝে মাঝে বঞ্চিত হয় বৈকী! অভিজিৎ তাঁর সৃষ্ট মানুষকে স্বাধীনভাবে চলতে দেবেন তো! অশোকের চিন্তাভাবনা, তার সংকট ও সংশয়, তার সংকল্প ও তৎপরতা প্রকাশের কাজ অভিজিৎ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এতে অশোকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি যতটা উদ্ভাসিত হয়, একজন আস্ত মানুষ সৃষ্টিতে মনোযোগ সেভাবে প্রকাশিত হয় না।

Scanned with CamScanner

তার উনপঞ্চাশ পৌকার সাইজের প্রতি হাঁক বরং ধামানের নিজস্ব। উপন্যাস পড়া শেষ হলেও এই ডাক কানে গমগম করে বাজে। বইটির প্রচ্ছদে গণেশ পাইনের *দি কল* ছবিটি উপন্যাসের শেষভাগে এসে এমন অস্থির ও সর্বগ্রাসী আহ্বানে পরিণত হয়েছে যে, অশোকের দুর্বল চেহারা আর মনে থাকে না। একই বইতে দুজন মানুষকে দুইভাবে নির্মাণের পেছনে কি অভিজিতের এই বোধ কাজ করেছে যে প্রশাসন ব্যাপারটির মধ্যে একটি ত্বরিতগমনের ভাব থাকে এবং মানুষের মুক্তির আহ্বান সবসময় দীর্ঘ ও অচঞ্চল? কিন্তু, বিষয় যাই হোক কিংবা চরিত্র যে স্বভাবের হোক, মানুষকে স্বাভাবিক গতিতে বেড়ে উঠতে না-দিলে সন্দেহ হয় যে তার সমস্যাটিকে লেখক উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছেন না।

বালুরঘাটের *বিবর্ণ মুখোস* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ইন্টারভিউতে অভিজিৎ সেন তাঁর লেখার ব্যাপারে একটি কৈফিয়ত দিয়েছেন। সোচ্চারভাবে মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁর রচনার ঐসব অংশ বাদ দিয়ে পড়বার পরামর্শ দিয়েছেন। এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা উচিত। যে কোনো লেখা পাঠকের হাতে পড়লে তার প্রতিটি বর্ণই পাঠের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার কথা। অভিজিতের রচনার কোনো অংশ বাদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং, পাঠক তাঁর কাছে যা দাবি করেন তা হল এই: ঐসব জায়গায় উপযুক্ত রক্তমাংস প্রয়োগের সুযোগ তাঁর করে নেওয়া উচিত। তা হলে চরিত্র গড়ে ওঠার স্বাধীনতা পাবে আরো বেশি। শক্তিশালী চরিত্র উপন্যাসের শরীরে রক্ত চলাচলের প্রধান ইন্ধন।...

যেমন দেখি *দেবাংশী* উপন্যাসে লোহার সারবান। সে কিন্তু আগাগোড়া নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে ঠেকা দেওয়ার জন্য লেখককে এগিয়ে আসতে হয়নি। লোকটি দৈবী ক্ষমতা পেয়ে সত্যি দেবতা হয়ে উঠেছিল, লেখক একবারও তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেননি, তাকে দেবতা হতে কোথাও কিছুমাত্র বাধা দেননি। তারপর দিন যায়, অল্প কয়েক পৃষ্ঠাতেই দিন যায়, কিন্তু লেখক সময়কে ঠেলে দ্রুত পার করিয়ে দেন না, লোকটি খেরা বেলার কলাগাছে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকে, শরীরের কাঁপুনি তার আস্তে আস্তে কমে, কমতে কমতে লোপ পায়, নিজের দৈবী ক্ষমতায় তার সন্দেহ হয়, রাতে তার ঘুম হয় না। তাকে জাগিয়ে রাখার জন্য কী জাগিয়ে তোলার জন্য অভিজিৎকে গান গাইতে হয় না। ফের দেবাংশীর ঐ আসন বর্জন করার বল সে জোগাড় করে নিজে নিজেই। এই গল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় সংস্কার আর শ্লোক আর প্রবাদ যেন হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে দেবাংশীকে নির্মাণ করে তুলেছে। মনে হয় গল্পটি কালনিরপেক্ষ। এই গল্প হাজার বছর আগেরও হতে পারত। হিউ-এন-সাঙ যখন

এসেছিলেন, পুণ্ড্রবর্ধন আর সোমপুরের বিহার নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে আশেপাশের গ্রামগুলোতে উঁকি দিলে তিনি এই দৃশ্য দেখতে পেতেন। কাহ্ন পা, লুইপার আমলেও দেবাংশী ছিল। কবিকঙ্কন, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, আলাওল, ভারতচন্দ্রের সময় দেবাংশী সশরীরে উপস্থিত। কৈবর্ত বিদ্রোহে দেবাংশীরা কী করেছিল? বল্লাল সেন এদের মানুষ বলে গণ্য করেনি, নইলে এমন বিধান একটা ছাড়ত মশামাছি-পংক্তিভুক্ত হয়ে ওদের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নিতে হতো। কিন্তু তখন ওরা ছিল। তারপর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রে, ভিস্তায়, করতোয়ায় কত জল গড়াল, বখতিয়ার খিলজি, হোসেন শাহ, শায়েস্তা খাঁ, আলিবর্দি, সিরাজদৌল্লা মাটির সঙ্গে মিশে গেল, দেবাংশীরা মাটির ওপরেই বিচরণ করে। সমুদ্রের ওপার থেকে সায়েবরা এল, সায়েবরা গেল, নতুন সায়েবরা চেপে বসল, দেবাংশীদের বিনাশ নেই। বাংলা জুড়ে কতকালের শয়তানি, জোচ্চুরি আর হারামিপনা চলে আসছে, প্রতিবাদও হচ্ছে আবহমানকাল ধরে। এসবের এই সর্বকালীন চেহারাটি অভিজিৎ নিয়ে এসেছেন অসাধারণ শক্তির সাহায্যে। কাহিনীর শেষে দেখি থিকথিক করছে ক্রুদ্ধ ও প্রতিবাদী মানুষের ভিড়। শয়তান এসে তাড়া-খাওয়া-কুত্তার মতো আশ্রয় নিয়েছে খেরা থানের গণ্ডিতে। ঐ জায়গাটা তখন পর্যন্ত ফাঁকা। এখনও ওটা ফাঁকাই রয়েছে। ঐটা দখল করার জন্য অভিজিৎ কোনো উপদেশ দেন না, জায়গাটা কেবল দেখিয়ে দিলেন। এর বেশি ইঙ্গিত কি কোনো শিল্পী দিতে পারেন? এরকম লেখায় অভিজিৎ যে-সংযম দেখাতে পারেন তা কিন্তু কোনো অলৌকিক শক্তি থেকে নয়, বরং দেশের, সমাজের ও ইতিহাসের ভেতরকার স্রোতটি বুঝতে পারেন বলেই এখানে বড় মাপের শিল্পী হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

এই হাজার বছরের শোষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিয়োজিত রাষ্ট্র এই কাজে ব্যবহার করে চলেছে সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি। কিন্তু তাতেই কি শেষ রক্ষা হয়? *দেবাংশীর* মতো শাশ্বত রক্ত *আইনশৃঙ্খলা* গল্পে নেই, রাষ্ট্র এখানে সশরীরে বিদ্যমান, সাম্প্রতিক পশ্চিম বাংলায় শোষণের জন্য ব্যবহৃত আধুনিক কায়দাকানুন এই গল্পে উপস্থিত। বুরোক্র্যাট-টেকনোক্র্যাটের মন কষাকষি, মন্ত্রীদের এর ওর পেছনে লাগা, এসবে গুরুত্ব যাই হোক, এ থেকে শৃঙ্খলা, ন্যায় ও নিয়মকানুনের পোজ-মারা-প্রশাসনের ভেতরটা একটু দেখা যায়। এই প্রশাসনকে কব্জা করার কাজে সতত সক্রিয় রাজনীতিকেও অভিজিৎ ঠিকঠাক শনাক্ত করেন। সমাজতন্ত্রের নাম করে যে-কমরেডরা ভোটের সুড়ঙ্গপথে ক্ষমতায় আসীন হয় তাদের পূর্বসূরীদের মতো তাদেরও একমাত্র লক্ষ্য সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার পর কংগ্রেসের বগা-পাণ্ডাদের সঙ্গে এই কমরেডদের আর পার্থক্য থাকে না। প্রশাসনের উন্নয়নের একটি ভূমিকা

Scanned with CamScanner

ইদানীং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এই উন্নয়নের পথে শোষণব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কীভাবে আসছে তার ইঙ্গিত রয়েছে, *আইনশৃঙ্খলা* গল্পে। সাম্রাজ্যবাদের শোষণশৃঙ্খল ও চালিয়াত রাজনীতির বাস্তবায়নের হাতিয়ার প্রশাসন, কিন্তু স্থির ও অচঞ্চল কোনো অমোঘ শক্তি নয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শোষণের শিকার নিহত টুইনার বিধবা স্ত্রী কুশলী যখন হাকিম সাহেবের ঘরে প্রসব বেদনায় কাঁপে। কুশলী তার শিশুকে জন্ম দেবে বলে হাকিম সাহেব তার সমস্ত লোকলস্কর নিয়ে তার এজলাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রকে বাইরে ঠেলে দিয়ে কুশলী তার নিহত স্বামীর আত্মজ রক্তপিণ্ডকে পৃথিবীতে অবতরণের উদ্যোগ নেয়। নবজাতকের চিৎকারে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা চালাবার ঘরের দেওয়াল ও কাচ থরথর করে কাঁপে। আমরা সবাই টের পাই যে কুশলীর ধৈর্যের সমস্ত বাঁধ ভেঙে পড়েছে। এবার চরম আঘাতের জন্য প্রতীক্ষা। চরম আঘাতে অভিজিৎ সেনের বিশ্বাস অবিচল। সত্তরের দশকে ভারতে যে-আন্দোলন সব কিছুর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল তার ভেতর তিনি মানুষ। *মহাবৃক্ষের আড়াল* গল্পের অনুপমও একদিন অভিজিতের সহযাত্রী ছিল। বিস্ফোরণ ঘটানো সেই আন্দোলন এখন আড়ালে পড়ে গেছে, অনুপম চাকরি করে সেইসব প্রতিষ্ঠানের একটিতে যাদের বিরুদ্ধে একদিন তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল সমস্ত পিছুটান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। সত্তরের দশক একেবারে নিভে যায়নি। ভিয়েতনাম থেকে চালান হয়ে আসা বিশাল বৃক্ষের ভেতর থেকে বেরুনো বুলেটের শিশে হাতে নিয়ে অনুপম তার ধমনীতে আবার রক্ত চলাচলের সাড়া পায়। মৃত বুলেট শুধু বারুদের গন্ধে তাকে ফের চঞ্চল করে তুলতেও তো পারে। পতন হওয়ার পরেও এই বৃক্ষ দুটো করাত ভেঙে ফেলেছে। এর সম্ভাবনা তাহলে বিনাশ করবে কে?

বাজিকরদের দীর্ঘ পদযাত্রায়, ধামান সাঁইয়ের ডাকে, দেবাংশীর আহ্বানে, কুশলীর নবজাতক সন্তানের প্রবল চিৎকারে, করাতের কাছে মহাবৃক্ষের নত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে অভিজিৎ সেন হাজার বছরের বন্দী মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে ঘোষণা করেন। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ চেতনায় এই স্পৃহা সুপ্ত রয়েছে, এই মানুষের ভাষায় এর খোঁজ পাওয়া যায়, তার গানে, তার শ্লোকে, তার প্রবাদে এরই প্রকাশ। তার সংস্কার ও সংস্কার ভাঙা, তার বিশ্বাসে ও বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলা— এসবের ভেতর যে-দ্বন্দ্ব তার মূলে মানুষের মুক্তির কামনা। অতীত থেকে, বর্তমান থেকে, ভাষা থেকে, গান থেকে, শ্লোক থেকে ও পুরাণ থেকে, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব থেকে মানুষ অবিরাম শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। এই শক্তি অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত শিল্পী অভিজিৎ সেন। এই অনুসন্ধানের কাজটি সুখের নয়, পাঠককে

স্বস্তি দেওয়ার পুণ্যও এখান থেকে অর্জন করা অসম্ভব। বরং যে হাড় বাজিকররা হাতে তুলে নিয়েছিল তারা তাই বাজিয়ে সবাইকে ডাক দিয়ে চলেছে। অদের বহুকাল আগেকার দেশের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পবিত্র নদী ঘর্ঘরার উত্তাল ঢেউ এই বাজনার সঙ্গে সংঘাত করলেও এর আওয়াজ মিঠে নয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মা, মেঘনা যমুনার মতো ঘর্ঘরাও বিশাল ও প্রাচীন সব তীরভূমি ভেঙে একাকার করে দেবে। হাড়ের বাজনায় যে-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাতে ভাঙনের নিশ্চিত আওয়াজ শোনা যায়।

Scanned with CamScanner